

কাঁটাতারের যন্ত্রণায় — সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’

ও

সাদাত হাসান মন্টোর ‘টোবা টেক সিং’

গৌরাঙ্গ পাল

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/11_Gouranga-Pal.pdf

সারসংক্ষেপ: দেশভাগ শব্দটা সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে তিনটে স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা অভিষাপ হয়ে আজও রয়ে গেছে দেশের মানুষের স্মৃতিতে। যে স্মৃতি ভুলিয়ে দিয়েছে একদিন তারা একই মাতৃভূমির মানুষ ছিল। যার জন্য আজ তারা বোঝে পাশের দেশটা শত্রু কেবল। কিন্তু এই মনোভাব আজকের নয়, সাধারণ মানুষেরও নয়। সরকারি সিদ্ধান্ত মাত্র। যা তিলে তিলে সাধারণ মানুষের রক্তে মজ্জায় মিশে গেছে সরকারি নির্দেশে। এই সরকারি নির্দেশেই দেশভাগ কতটা বিভিষিকাময়, যন্ত্রণাময় হয়ে উঠেছিল সেটা ধরা পড়েছিল সদ্য গঠিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই সাহিত্যিকের প্রবন্ধে। কাঁটাতারের যন্ত্রণায় — সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী’ ও সাদাত হাসান মন্টোর ‘টোবা টেক সিং’ — শীর্ষক প্রবন্ধটি সেই কলঙ্কিত অধ্যায়েরই স্মারক হিসাবে আলোচিত।

সূচক শব্দ: দেশভাগ, কাঁটাতার, দেশ, মানুষ, সাহিত্য, সমাজ, সরকারি নীতি

১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট অখণ্ডিত ভারতবাসীর কাছে যেদিন হওয়ার কথা ছিল অখণ্ডিত আনন্দের দিন, সেদিনটাই মাত্র একটি সিদ্ধান্তে পরিণত হয়েছিল অভিষণ্ড দিনে। আনন্দের পাশাপাশি আশঙ্কা জন্ম নিয়েছিল খণ্ডিত ভারতবর্ষের মানুষের মনে। ভারতের স্বাধীনতার পাশাপাশি জন্ম হলো দুটি নতুন দেশের পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান। সেদিনটা হওয়ার কথা ছিল দীর্ঘ দু’শো বছরের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার দিন। সেদিনটায় একটা বৃহৎ ভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। তাই মনে প্রশ্ন এলো, এ কেমন স্বাধীনতা? এই দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষ তো ভারতবাসীর কাম্য ছিল না! কেবলমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেল দুটো দেশ। জন্ম হলো দুটো নতুন দেশের। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ আরো আগেই ছড়িয়ে দিয়েছিল ঔপনিবেশিক ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসকেরা। সেই বিষেই এবার বহু মানুষ হয়ে পড়লো গৃহহারা, স্বজনহারা, সম্পদহারা উদ্বাস্তু। দেশভাগের জন্য যখন ভারতবর্ষ সাম্প্রদায়িকতার আগুনে জ্বলছিল তখন মুসলিম লিগের নেতৃবর্গ পাকিস্তানের দাবি থেকে একচুলও সরে আসতে সম্মত হননি। কংগ্রেসের নেতারাও এই সময় ছিলেন অস্বাভাবিক নিশ্চল এবং মহাত্মা গান্ধী ছিলেন দিল্লীর ক্ষমতা দখলের লড়াই থেকে শত যোজন দূরে। দেশভাগ নিয়ে কোনো পরামর্শ ছাড়াই জহরলাল নেহেরু ও বল্লভভাই প্যাটেল এতে সম্মতি দান করেন। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সাতাত্তর বছর অতিক্রান্ত হলেও ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে কী প্রকৃতিই শান্তি বা স্বস্তি এসেছে? এখনো জাতিভেদ, ধর্মভেদ মানুষকে তাড়া করে ফিরছে।

কালের পরিক্রমায় মহামানবেরাও দেশভাগের তীব্র বিরোধীতা করেছেন। অন্নদাশংকর রায় দেশবিভাগের ক্ষোভে লিখেছেন — “তেলের শিশি ভাঙল বলে / খুকুর প’রে রাগ করো / তোমার যে সব বুড়ো খোকা / ভারত ভেঙে ভাগ করো!” দেশভাগের এই মশুল গুনতে হয়েছিল বাংলা ও পাঞ্জাবকে সব থেকে বেশি। দেশভাগের আগে ভারতবর্ষ যখন সাম্প্রদায়িকতার আগুনে জ্বলছিল — লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়েছিল গৃহহীন, সম্বলহীন। হাজার হাজার নিরীহ ভারতবাসী সাম্প্রদায়িক দানবের খাদ্যে পরিণত হয়েছিল। তখন মুসলিম লিগ

নেতারা পাকিস্তানের দাবি থেকে একচুলও সরে দাঁড়াতে সম্মত হয়নি। কংগ্রেস নেতারা লিগের চাপের কাছে যখন আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত, তখন মহাত্মা গান্ধী ছিলেন দিল্লীর ক্ষমতা দখলের লড়াই থেকে অনেক দূরে। অন্যদিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের দীর্ঘ আলোচনায় বিরক্ত হয়ে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেছিল — কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ একমত হোক বা না হোক, তারা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবে। লর্ড ওয়াভেল এই ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ ত্বরান্বিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর জায়গায় ইংল্যান্ড অভিজাতদের কুলতিলক লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয়ের দায়িত্ব দিয়ে ভারতে পাঠানো হয়। ভারত ভেঙে পাকিস্তান গঠনের সিদ্ধান্তে লিগ নেতাদের রাজি করাতে, তাকে বেশি বেগ পেতে হয়নি। ভারত ভাগের প্রস্তাবে কংগ্রেস নেতাদের পক্ষ থেকে বাধ সাধেন মহাত্মা গান্ধী। তাই কূটনীতিক মাউন্টব্যাটেন তাঁকে দাঙ্গা দমনের দায়িত্ব দিয়ে দিল্লী থেকে দূরে বাংলায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবে লিগ নেতারা ও কংগ্রেস নেতারা রাজি হওয়ার পর গান্ধীর পক্ষে দিল্লীতে আর নতুন করে দেশভাগ বিষয়ে আলোচনা শুরু করা সম্ভব ছিল না। অন্যান্য নেতাদের এহেন আচরণ গান্ধীজীকে আঘাত করে। সমগ্র দেশে যখন সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলছিল, গান্ধীজী সম্ভবত তাতে আর ঘটাহুতি দিতে চাননি। ফলে, মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শ অনুযায়ী ভারত বিভক্ত হয়ে যায়। ইতিহাস এই তথ্যের সাক্ষ্য বহন করে। ব্রিটিশ পালামেন্ট ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করে। সেখানে জিন্নাহর স্লোগান ছিল ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ আর নেহেরুর স্লোগান ছিল ‘জয়হিন্দ’।

দেশভাগের প্রভাব কেবলমাত্র দেশবাসীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনেই প্রভাব ফেলেছিল তা নয়, প্রভাব ফেলেছিল সাংস্কৃতিক জীবনচর্চায়ও। তাই, সাহিত্য থেকে নাট্যক্ষেত্র আঙিনায় খেলে গিয়েছিল দেশভাগের ঢেউ। দেশভাগের প্রতিফলন থেকে তার নিষ্ঠুরতার সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল সাহিত্য জগৎ। দেশভাগ তৎকালীন কবি ও সাহিত্যিকদের মননে ঠিক কতটা প্রভাব ফেলেছিল তার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে রয়ে গেছে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের পাতা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে লিখছেন সদ্য হওয়া পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাঁর ছোটগল্প ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ আর সাদাত হাসান মান্টো সদ্য গঠিত পশ্চিম পাকিস্তানের স্মৃতি বুক নিয়ে লিখছেন, ‘টোবা টেক সিং’।

১৯৪৮ সাল, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ‘নয়াসড়ক’ নামে একটি সাহিত্যপত্রিকা। যেখানে প্রকাশ পেয়েছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’। পরবর্তীকালে এই কাহিনী ঠাই পায় লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ ‘দুই তীর ও অন্যান্য গল্প’ গ্রন্থে। কিন্তু, ততদিনে বদলে গিয়েছিল মূল কাহিনীর অনেকাংশ। সমকালীন পরিস্থিতির কথা মনে রেখেই কাহিনীর কিছু অংশে বদল আনেন লেখক। ‘দেশভাগ’ এই শব্দটা, এই পরিস্থিতিটা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে নাড়া দিয়েছিল ভীষণভাবেই। তাই, তাঁর ছোটগল্প থেকে উপন্যাসের পাতায় বারবার উঠে আসতে দেখা গেছে দেশভাগের নানা চিত্র। কয়েকজন মানুষের চাপিয়ে দেওয়া একটা সিদ্ধান্ত যে কী বিপদ ডেকে এনে দিয়েছিল অগণিত নিরাপরাধ মানুষের জীবনে, সেই ছবি নিজের কলম দিয়ে বারবার আঁকতে চেয়েছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। বারবার তাঁর কলমেই ধরা দিয়েছে বাস্তুহারা হয়ে পড়া মানুষগুলোর জীবনের নানা দিক। ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ লেখকের কলমে ফুটে ওঠা সেই নানা দিকেরই একটা খণ্ড চিত্র।

একেবারে রাস্তায় উঠে আসা একটা দোতলা বাড়ি। মতিনরা হঠাৎ করেই খুঁজে পায় বাড়িটাকে। যেমন করে অন্যান্য বাড়িগুলোকে ফেলে রেখে রাতারাতি দেশছাড়া হয়ে গিয়েছিল তাদের মালিক, ঠিক তেমনি বোধহয় এই বাড়িটার মালিকও আচমকাই বাস্তু থাকতেও হয়ে গিয়েছিল বাস্তুহারা। বাড়িটার পিছনের দিকে পড়ে থাকা জমিটা দেখে মনে হবে, বাড়ির মালিক যেন প্রয়োজন বোধ করেননি সামনে এক টুকরো জায়গা রাখবার। মনের ভিতরে পুষে রাখা এক টুকরো বাগানের সখের মালিক, মতিনের মনে তাই বাড়ির সামনে না থাকা বাগানটা বারবার খোঁচা দেয়। একটা অজানা অচেনা দেশে এসে যখন এক টুকরো ছাদের খোঁজে ওরা ছুটে বেড়াচ্ছে শহরের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে তখন এই বাড়িটা মতিনের মতো আরো অনেকের চোখে পড়ে।

ওরাই তালা ভেঙে এই বাড়িতে আশ্রয় নেয় বা বলা ভালো দখল নেয়। কাদের, আমজাদ, ইউনুস, মোদাবের মতো ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার মানুষেরা নিদ্বিধায় একই ছাদের তলায় এসে আশ্রয় নেয়। পরিত্যক্ত একটা বাড়ি মুহূর্তে ওদের কোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে। বেআইনিভাবে দখল নেওয়া এই বাড়িটায় প্রাথমিকভাবে নানারকম পুলিশি ঝামেলাকে সামাল দিয়ে ওরা নিজেদের গুছিয়ে নেয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন আসে ওদের মানসিক অবস্থায় কারণ — এই বাড়িটি খুঁজে পেয়েছিল ওরা। ওদের মাথা থেকে আপাতত সরে গেছে ঠাঁই খুঁজে নেওয়ার ভাবনা। ওদের এই বদলে যাওয়া সময়ের আয়না হয়ে ওঠে মতিন। ওর মনে প্রতিবিস্মিত হতে থাকে, হুঁকাসেবী আমজাদ, গল্পপ্রেমী কাদেরদের পাশাপাশি রাতারাতি বাস্তুহারা হয়ে পূর্ব বাংলা ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় চলে যাওয়া সেই হিন্দু পরিবারটির কথা। তাদের বাড়িটা আজ ওদের। ওদের মনে পড়ে যায় একদিন ওরা থাকত কলকাতার ব্লকম্যান লেনের খালসি পট্টিতে, বৈঠকখানায় দফতরিদের পাড়ায় সৈয়দ সালাহ লেনের তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কিংবা কমরু খানসামা লেনের অকথ্য একটা পরিবেশের মধ্যে। মনে মনে ওরা তুলনা করে আজকের এই বাড়িটার সঙ্গে ওদের অতীতের সেই বাসস্থানের। ম্যালকিওড স্ট্রিটের চামড়ার গন্ধ ওঠা গলির এককালের বাসিন্দা ইউনুস নিজের শরীরের পরিবর্তন দেখত পায় সহজেই। এখন ওরা সশ্বেদ বাড়ি ফিরে একে অন্যের সঙ্গে গল্প করে, গানের আসর থেকে পানের আসর সবই বসায় মাঝে মাঝে। সেগুলো ওদের মানসিক অবস্থার আভাস দিতে থাকে। এরই মাঝে একদিন মোদাবের চোখে পড়ে যায় সেই খয়েরি হয়ে আসা পাতার ছোট্ট তুলসী গাছটি। যেটা ওদের প্রত্যেককে মনে করিয়ে দেয়, দেশভাগের ইতিহাস, ধর্মের ইতিহাস। কিন্তু, বিধর্মী হয়ে শত আপত্তি স্বত্বেও কেউ তুলসী গাছটাকে উপরে ফেলতে পারে না। এমনকি, যে মোদাবের গাছটাকে উপড়ে ফেলতে চেয়ে বলেছিল, “আমরা যখন এ বাড়িতে এসে উঠেছি তখন এখানে কোন হিন্দুয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না।” সে পর্যন্ত অন্যদের উপড়ে ফেলার কথা বললেও নিজে তা করতে পারে না। বরং একদিন চেয়ে দেখে খয়েরি হয়ে যাওয়া পাতাগুলো আবার কেমন করে যেন সবুজ হয়ে গেছে। বোঝে ইউনুস যেমন গাছটাকে উপড়ে ফেলা আটকে দেয় নিজের শরীরের দোহাই দিয়ে তেমনি কেউ জল দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে তুলছে। ওদের মনে পড়ে,

হিন্দুবাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্তী তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। আজ যে তুলসী গাছের তলে ঘাস গজিয়েছে উঠেছে, সে পরিত্যক্ত তুলসী গাছের তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিতো। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ একাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, তখন নায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তান্ত স্পর্শে একটা শান্ত-শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠতো প্রতিদিন। ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারো জীবন প্রদীপ নিভে গেছে, আবার হাসি-আনন্দের ফোঁসরাও ছুটেছে সুখ-সময়ে, কিন্তু এ প্রদীপ দেওয়া অনুষ্ঠান একদিনের জন্যও বন্ধ থাকে নাই।

মতিনের চোখে ভেসে ওঠা একজন নারীর অদেখা অচেনা মুখ, ভেসে ওঠে বিশাল রেল ইয়ার্ডের পাশে রোদে শুকানো লাল পাড়ের একটা কালো শাড়ি। কিংবা, রেলগাড়ি জানালা দিয়ে চেয়ে থাকা একটা উদাস দৃষ্টি। যে নাকি রোজ একদিন রোজ এই তুলসী গাছটার তলায় বসে প্রদীপ দিতো। আজ সে কোথায় হারিয়ে গেছে মতিন জানে না। কেবল অনুভব করে সেই হারিয়ে যাওয়া দিনের স্মৃতি আর হারিয়ে ফেলা মানুষটার কষ্ট। অনুভব করে, “প্রতিদিন এ তুলসী তলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়তো ছলছল করে ওঠে।” কারণ ও নিজেও যে রাতারাতি চলে এসেছিল একটা নতুন দেশে, নিজের সমস্ত স্মৃতি অন্য কোথাও ফেলে রেখে।

নিজের দেশই যাদের উদ্ধাস্ত করে দিয়েছে, অপরের দেশে গিয়ে তারা নিশ্চিত ঠাঁই পায় কী করে! তাই আবারও ইউনুস, মতিন, মোদাবদের জীবনে ফিরে আসেন পুলিশ সাহেব। এবার সরকার পক্ষের বার্তাবাহক হয়ে আসেন তিনি। খবর দেন, “গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে।” প্রথমে জানা যায় চব্বিশ ঘন্টায়, তারপর জানা যায় সাতদিনে তাদের বাড়িটা ছেড়ে যেতে হবে। অবশেষে দশদিনে তারা বাড়িটা ছেড়ে যায়। ফেলে রেখে যায় ছেঁড়া কাগজ, পুরানো দড়ি, বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, ছেঁড়া জুতোর গোড়ালি। পুলিশ আসার দিন থেকে আর কারোর তুলসী গাছটার কথা মনে হয়নি, মনে হয়নি কোনো গৃহকর্তীর চোখের জলের কথাও।

আসলে, মানুষের বেঁচে থাকার প্রাথমিক চাহিদাগুলোর মধ্যে বাসস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক চাহিদা। দেশভাগ সেই প্রাথমিক চাহিদার মূলে এনেছিল আঘাত। তাই, যে মুহূর্তে আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল ওদের বাসস্থানের চিন্তা সেই মুহূর্তে তলিয়ে গিয়েছিল তুলসী গাছের স্মৃতি। তুলসী গাছটা এখানে কোনো একটা হিন্দু পরিবারের স্মারক নয়, তুলসী গাছ মানুষের মানসিক সুখের প্রতীক। তাই, বারবার মানুষের মনের অসুখে তুলসী গাছটাকে খয়েরি হয়ে উঠতে হয়। সদ্য জন্ম নেওয়া এপার বাংলা — ওপার বাংলায় ১৯৪৭ সালে দাঁড়িয়ে এমন অসংখ্য তুলসী গাছেরা অবহেলায় হয়ে উঠেছিল খয়েরি। ১৯৪৮-এ দাঁড়িয়ে যার কাহিনি লিখছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

সাহিত্যিক সাদত হাসান মান্টো, ভারত ও পাকিস্তান বিভাজনের মানবিক মূল্যের মর্মস্পর্শী এবং অদম্য চিত্রায়নের মাধ্যমে ইতিহাসে তাঁর নাম খোদাই করেছেন। তাঁর ছোটগল্প, ‘টোবা টেক সিং’ গল্পটি লেখা হয়, দেশভাগের পরে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে। গল্পটি লাহোরের একটি মানসিক আশ্রয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, হিন্দু এবং মুসলিম উভয় বন্দী তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ অশান্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নবগঠিত দেশগুলি তাদের জেলে বন্দী থাকা মানুষদের ‘পাগল’ হিসাবে চিহ্নিত করে এক দেশ থেকে আর এক দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের এই ধরনের সরকারি সিদ্ধান্ত সহজে কার্যকর হতে পেরেছিল, বিশান সিং এর মতো মানুষদের কর্মকাণ্ডে। কারণ দেশ হারানোর যন্ত্রণা এদের সত্যিই পাগল করে তোলে। গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বিশান সিং, টোবা টেক সিং এর একজন ব্যক্তি, যিনি দেশভাগের অযৌক্তিকতার করুণ প্রতীক হয়ে ওঠেন। সদ্য টানা সীমান্তের, ওপারে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রমশ দিশেহারা হয়ে পড়ে, তার চারপাশের উন্মাদনায় তার নিজের অনুভূতি বিলীন হয়ে যায়।

‘টোবা টেক সিং’ ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত সাদাত হাসান মান্টোর একটি ব্যঙ্গাত্মক ছোট গল্প। যে গল্পে মান্টো তুলে এনেছেন দেশভাগের পরবর্তী সময়ের রুঢ় বাস্তব চিত্র। দেশভাগের পরবর্তী কয়েক বছরে লাহোরে আশ্রয়ে থাকা কিছু বন্দীদের ভারতীয় ভূখণ্ডে স্থানান্তর করা হয়েছিল। গল্পের কাহিনি নির্মিত হয়েছে জেলে বন্দী এক কয়েদীর জীবনকে কেন্দ্র করে। টোবা টেক সিং এর একজন শিখবন্দী বিশান সিংকে কেন্দ্র করে, তাকে তার সহবন্দীরা তার শহরের নাম দিয়ে উল্লেখ করে। বিশান সিং ভারতে যেতে চায় না, কারণ তার নিজের শহর টোবা টেক সিং এখন পাকিস্তানে। তাই তিনি পাকিস্তানে যেতে চান। যে দেশ তিনি না থাকাকালীন অবস্থায় বিভাজিত হয়ে গেছে সেই দেশে তিনি থাকতে চাননি। তাই ভারতেও তিনি যেতে নারাজ। তার এই ধরনের সিদ্ধান্তের জন্য তাকে ‘পাগল’ বলে মনে করে সকলে। তিনি বারবার জিজ্ঞেস করেন, ‘টোবা টেক সিং কোথায়? ভারতে না পাকিস্তানে?’ তার বারবার বলা কথাগুলো ধ্বনিত হতে থাকে, ‘Uper the gur gur the annexe the be dhyana mung the dal of Toba Tek Singh and Pakistan’। তার এই কথাগুলো দেখে তার মানসিক অবস্থার সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। কিন্তু তার এই প্রতিক্রিয়াকে মানবিক দিক দিয়ে দেখবার কেউ ছিল না। আসলে এই বিশান সিং সেইসময় একা নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিভূ। যারা দেশ হারিয়ে, বাস্তু হারিয়ে হয়ে গিয়েছিল দিশেহারা। যারা অকারণে হয়ে গিয়েছিল জেল খাটা আসামী, জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দেখেছিল তার দেশটাও আর তার নেই। এমনকি সে চাইলেও আর তার নিজের দেশে থাকতে পারবে না। বাস্তবচ্যুত হওয়ার যন্ত্রণা আসলে এমনি। বিশান সিং যেমন টোবা টেক সিং এ ফিরে যেতে পারেনি, তেমনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা বহু মানুষকে চলে যেতে হয়েছিল দণ্ডকারণ্য, আন্দামান কিংবা এমনই নানা পরিত্যক্ত স্থানে। কেবল মাত্র সরকারের সিদ্ধান্তে। মানুষের ইচ্ছার কোনো দাম ছিল না সেই সময় পর্বে। তাই দ্বিখণ্ডিত ভারতের মানুষগুলো কোথায় যাবে? কিংবা যারা দুই জায়গাতে থাকতে চায় তাদের কী হবে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর বিশান সিং যেমন পায়নি তেমনি পায়নি, লক্ষ লক্ষ মানুষ, তারা জ্বলেছিল কেবল দেশভাগের যন্ত্রণায়। বিশান সিংয়ের মতো অসংখ্য মানুষ থেকে যেতে চেয়েছিল নো ম্যানস ল্যান্ডে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। মান্টোর নিপুণ গল্প বলার কৌশল পাঠককে প্রান্তিক ব্যক্তিদের দুর্দশার প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে। দেশভাগের চরম বাস্তবতা প্রকাশ করেছেন, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অমানবিকরূপ প্রকাশিত হয়েছে গল্পে।

গল্পটি কেবল দেশভাগের সমালোচনাই নয়, এটি যে কোনো ধরনের বৈষম্য ও কুসংস্কারের অমানবিক প্রভাবের একটি মর্মান্তিক ভাষ্য।

সাদাত হাসান মাস্টো আর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অখণ্ডিত ভারতের দুই প্রান্তে থাকা দুইজন সাহিত্যিক। দেশভাগ নামক কাঁটাতার এঁদের দুজনকেই বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, মূল ভারতভূমি থেকে। এই দিন হঠাৎ করে এঁরা একজন পশ্চিম পাকিস্তান অপরজন পূর্ব পাকিস্থানের অধিবাসী হয়ে গিয়েছিলেন নিজেদের অনিচ্ছাতেই। তাই দুজনের কলমেই ধরা পড়েছিল দেশভাগের দুটি ভিন্ন রূপ। একদিকে সরকারি কারণে কলকাতা শহরে একটা মাথা গোঁজার ঠাই পেয়ে অবলীলায় ছেড়ে দিতে হয়েছিল সে ঠাই, অপরদিকে সরকারি কারণে নিজের দেশে ফিরে যেতে চেয়েও এক যুবক, অকারনেই পাগল হয়ে ভিন্ন দেশে ঠাই নিতে হয়েছিল তাকে। দেশভাগ নামক যে বিভীষিকাময় শব্দটা লেখা হয়েছিল সেদিন — সময়ের সাধ্য নেই তাকে মুছে ফেলার। তাই এককালে একত্রে থাকা স্থানগুলো আজ ভিন্ন দেশ হয়ে, একে অন্যের প্রতি বিষই উগরায় কেবল।

গ্রন্থস্বর্ণ :

১. গৌরাজ মন্ডল (সম্পা.), ‘বাংলাদেশের গল্প; প্রথম খণ্ড’, প্যাপিরাস, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩
২. সমরকুমার মল্লিক, ‘আধুনিক ভারতের রূপান্তর রাজ থেকে স্বরাজ (১৮৫৮-১৯৪৭)’, কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ২০১২
৩. সুমিত সরকার, ‘আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭)’, কে পি বাগচী অ্যান্ড কম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৫

লেখক পরিচিতি : গৌরাজ পাল, গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।